উৎসবে
মাতি
বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে, ২৬শে মার্চ ২০১৭

ভূমিকা

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় ..."

স্বাধীনতা মানে উচ্ছলিত প্রাণে পাহাড় হতে নেমে যাওয়া নির্ঝরিণীর কল্লোলিত স্রোত। স্বাধীনতা অনুভবে নিজেকে মনে হয় মুক্ত আকাশে ডানা মেলা মুক্ত বিহঙ্গের মতো। স্বাধীনতা মানে পাখিদের কলকাকলিতে ঘুম ভাঙা প্রভাত, পাপিয়ার কুহুতানে আবেশিত প্রতিবেশ। স্বাধীনতা মানে সকল সৃষ্টিকুল যে যার সীমাতে অবাধ মুক্ত।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ ভয়াল কালোরাত। এ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের উপর বর্বর ও পৈশাচিক হামলা চালানো হয়, পরিচালিত হয় পরিকল্পিত গণহত্যা। ১৯৭১ এর মার্চ ও এর পূর্ববর্তী সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আদেশে ১৯৭০ এর নভেম্বরে পরিচালিত হয় অপারেশন ব্লিটজ। এ অপারেশন ব্লিটজ-এর পরবর্তী অনুসঙ্গ ১৯৭১-এর ২৫ মার্চে শুরু হওয়া অপারেশন সার্চ লাইট, উদ্দেশ্য ছিল ২৬ মার্চের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বড়ো বড়ো শহর দখল নেওয়া এবং এক মাসের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

২৫ মর্চের কালোরাতের পোড়া মাটি, লাশের সারি আর জননীর চোখ থেকে রক্তঝরা বিভীষিকার পর রক্তে রাঙা স্বপ্নময় নতুন ভোর ২৬ মার্চ ১৯৭১। জনতার পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়, জ্বলে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের চোখ, তাই অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না করেই অনেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে আর গড়ে তোলে প্রতিরোধ। অতঃপর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার পর আপামর জনতা পশ্চিম পাকিস্তানী জনতার বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তলাল রাজপথ আর যুদ্ধক্ষেত্র মাড়িয়ে এদেশের অকুতোভয় বীর যোদ্ধারা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়, একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র ও একটি লাল-সবুজ পতাকার গর্বিত মালিক হয় এদেশের জনতা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করে, ২৬ মার্চ তাই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সেই গৌরব ও অহঙ্কারের দিন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারিতে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৬ মার্চকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পরিচিত এবং সরকা্রিভাবে এ দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

২৬ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের ৪৬ বছর। বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়। সব ভবন ও শহরের প্রধান সড়কগুলোতে জাতীয় পতাকা উড়তে থাকে, মুক্তিযুদ্ধ শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে স্মৃতিসৌধ, নির্বিশেষে লাখো মানুষের ঢল নামে সেথায়। অনেক দামে কেনা এ স্বাধীনতা রক্ষা এবং এ স্বাধীনতার সুফল দ্বারে দ্বারে, হাতে হাতে, মন-মননে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলেই কেবল এ ঐতিহাসিক অর্জনের সার্থকতা, স্বাধীন জাতি হিসাবে অনেক গৌরবের।

বাংলা-কবিতা ডট কমের প্রতিটি সদস্য আজ এ উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য উৎসবের গর্বিত অংশীদার। বাংলা-কবিতা ডট কম পরিবারের পক্ষ থেকে সকল মুক্তিসেনাদের প্রতি লাখো-কোটি রক্তিম সালাম। বাংলাদেশের গর্বিত স্বাধীন পতাকা পতপত উড়তে থাকুক অবিরত অনন্তকাল।

- মোঃ ফিরোজ হোসেন

-:: সূচিপত্র ::-

বাংলা কবিতা ডটকম ওয়েবসাইটের সদস্যদের কলমে রচিত বিশেষ ই-সংখ্যা **উৎসবে মাতি**
বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে, ২৬শে মার্চ ২০১৭

প্রবন্ধঃ-

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ • দীপঙ্কর বেরা • ২-৩

কবিতাঃ-

স্বাধীনতা • খলিলুর রহমান • ৪
বিজয়ের কাছে ঋণী • মোঃ ফিরোজ হোসেন • ৫
লাল সবুজ স্বাধীনতা • হাসান ইমতি • ৬
কাঁটাতারের স্বাধীনতা ট • সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় • ৭
স্বাধীনতাময় • ডঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস • ৮
বাঁচতে চাই না স্বাধীনতা চাই • শাহিন আলম সরকার • ৯
আলোর পথের কান্ডারি • মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন • ১০
রুখবো এবার শকুনের থাবা • মোঃ নিজাম গাজী • ১১
স্বাধীনতা অতি প্রিয় • মোঃ সানাউল্লাহ্ • ১২
স্বাধীনতার সূর্যোদয় • অজিত কুমার কর • ১৩
আমরা বীরাঙ্গনা বলছি • মোনায়েম সাহিত্য • ১৪-১৭
কচুরিপানার ডকুমেন্টারি • সাকিব জামাল • ১৮
কোথায় স্বাধীনতা • মৌটুসি মিত্র গুহ • ১৯
প্রার্থনা • রিঙ্কু রায় • ২০
জয় বাংলা • গোলাম রহমান • ২১
স্বাধীনতা • অনুপ মজুমদার • ২২-২৩
জ্বলে ওঠে দীপশিখা • জয়শ্রী রায় মৈত্র • ২৩
স্বাধীনতা তোমার জন্য • পলাশ দেবনাথ • ২৪
পতাকা • মোবারক হোসেন • ২৪
স্বাধীনতার স্বরূপ • সুহেল ইবনে ইসহাক • ২৫
আমার স্বাধীনতা • তুহিন আহমেদ • ২৫
মুক্তি • শ্রী সৌমেন চৌধুরী • ২৬
সাধের স্বাধীনতা আমার • অনিরুদ্ধ বুলবুল • ২৭
একটি কালো রাতের গল্প • মৃন্ময় • ২৮
স্বাধীনতা পাওয়া • ছবি আনসারী • ২৯
তবুও অভিমান • এম ওয়াসিক আলি • ৩০
একটি প্রশ্ন • মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান • ৩১
সোনার দেশ বাংলাদেশ • জয়শ্রী কর • ৩২
স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস • তাহমিদ হাসান • ৩২
নাম স্বাধীনতা স্বপন কুমার দাস • ৩৩
কথা দাও স্বাধীনতা • হুমায়ূন কবির • ৩৪

আলোচনাঃ-

বীরশ্রেষ্ঠদের সংক্ষিপ্ত জীবনী • মোনায়েম সাহিত্য • ৩৫-৪৩

লিপিসজ্জা • সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় **অলঙ্করণ** • ডঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস
উদ্যোক্তা • মোনায়েম নিজাম খান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

- দীপঙ্কর বেরা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ সালে সংঘটিত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে একটি জনযুদ্ধের আদলে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে।

পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ হত্যা করে এবং গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দল আওয়ামি লিগ প্রধান বাঙালির তৎকালীন জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে।

গ্রেফতারের পূর্বে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ; জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর), ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ, সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে।

ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন তারা মুক্তিবাহিনীর কাছে হারার লজ্জা এড়ানোর জন্য পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যাতে তারা বলতে পারে তারা ভারতের কাছে হেরেছে মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়। তারপর ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে।

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যদুস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

এরই মাধ্যমে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়; প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

টেক্সাসে বসাবাসরত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রহক মাহবুবুর রহমান জালাল বলেন, "বিভিন্ন সূত্র ও দলিল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই প্রমাণ হয় যে, ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, যা ছিল তার বা অন্য কারো হয়ে ঘোষণা দেয়ার অনেক পূর্বে।

২৫ মার্চে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ভেঙে গেলে ইয়াহিয়া গোপনে ইসলামাবাদে ফিরে যান। এবং গণহত্যা চালানোর পরপাকিস্তানি সেনারা সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুসহ তার পাঁচ বিশ্বস্ত সহকারীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে যান। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক"।

২৫ মার্চ থেকে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত সকল সাংবাদিককে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ২ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখে।

স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে ঘোষণা হয় যে "শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে সাত কোটি জনগণকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দেশের নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করেছেন"। গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে স্বাধীনতার মূল ঘোষককে ছিলেন তা নিয়ে ব্যপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

এই কারণে ১৯৮২ সালে সরকারিভাবে একটি ইতিহাস পুস্তক প্রকাশিত হয় যাতে ৩টি বিষয় উপস্থাপিত হয়।

১. শেখ মুজিবুর রহমান একটি ঘোষণাপত্র লিখেন ২৫ মার্চ মাঝ রাত কিংবা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

২. শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাপত্রটি ২৬ তারিখে বেতার থেকে প্রচারিত হয়। কিন্তু সীমিতসংখ্যক মানুষ সেই সম্প্রচারটি শুনেছিল।

৩. পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের হয়ে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলাদেশকে এক স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

স্বাধীনতা

- খলিলুর রহমান

খাঁচার পাখি শুধায় বনের পাখিরে,
সত্যি করে বল দেখি স্বাধীনতা কীরে?

বনের পাখি বলে, আদরে প্রদত্ত অঢেল খাদ্য ও জল
কিছু খাও, বাকিটা ছিটাও - এই তো স্বাধীনতার সুফল -
ঠিক যেমন তোমার পায়ে যায় গড়াগড়ি।

খাঁচার পাখি বলে, এমন স্বাধীনতার গলায় দড়ি
প্রতিদিন বারেবারে
মুক্তির কান্নায় ডানা ঝাপটায় খাঁচার দ্বারে
ঝরে পড়ে রক্তাক্ত দেহ থেকে এক একটি পালক
আমিই নই আমার এ জীবনের চালক,
তাই চাই অবারিত উড়ে চলা উন্মুক্ত আকাশে|

বনের পাখি বক্র হাসি হাসেঃ
যা দেখো উন্মুক্ত তোমার খাঁচা হতে
চাতুর্যের কন্টকে ভরা সেই পথে পথে।
সারাক্ষণ প্রাণান্ত ছুটে চলা সেথা ক্ষুধা-তৃষ্ণায়
দিনান্তে তোমার অর্জন লুণ্ঠিত হয় শক্তিধরের রসনায়।
হিংস্র চিল, শকুন, সিংহ, হায়েনা, শার্দুল
ওঁৎ পেতে পদে পদে, ক্ষুদ্র ভুলে প্রাণাবসান হয় নির্ভুল।

খাঁচার পাখি বলে, সে দারুণ অপরাধ
মুক্ত করো মোরে, আজ থেকে দোঁহে তার করি প্রতিবাদ।

বনের পাখি বলে, সে অক্ষমণীয় দুঃসাহস প্রচন্ড
প্রতিদিন বিদ্রোহী প্রতিবাদী এখানে পায় মৃত্যুদণ্ড -
এখানে জীবন বাঁচে শক্তিধর তস্করের উচ্ছিষ্টে
যারা বিক্রি করে স্বাধীনতা তাদের পদলেহী-শিষ্টে
বিনিময়ে দখলি স্বাধীনতায় যারা করে ভক্ষণ
তাদের চেয়ে দুর্বলের মুখের গ্রাস, আর তাদের জীবন।

বিজয়ের কাছে ঋণী

- মোঃ ফিরোজ হোসেন

সেই পঁয়তাল্লিশ বছর আগে
একইসাথে একপাশে বিজয় আনন্দে আত্মহারা
অন্যপাশে প্রিয় ভাই, পিতার চিরবিদায়ের খবর
দুঃসহ বেদনার্ত চোখে মহাসমুদ্র কষ্টজল
কত ত্যাগ ! কত রক্ত ! হিসাববিহীন
প্রিয়জনহারা অগণিতের বুকফাটা কান্না
ষোলোই ডিসেম্বর, অনেক সাধনায় সাধের বিজয়
অনেক কষ্টে কেনা স্বাধীনতা
সে বিজয়ে খুব বেশি মূল্য দেয়া
বড়ো বেশি ঋণ সে বিজয়ের কাছে ।

অগণন স্বপ্ন ভঙ্গের ভিড়ে
সময়ের কাছে দিনে দিনে জমেছে অনেক দায়
হয়তো নতুন কোনো সময়ে নতুনের ডাকে
কড়ায়-গন্ডায় শোধাতে হবে এসব ঋণ ।

লাল সবুজ স্বাধীনতা

- হাসান ইমতি

এ
লাল
সবুজ
স্বাধীনতা,
মুক্তির স্বাদ,
অর্জনের নাম,
স্বকীয়তা নিঃশর্ত,
আত্মসন্মান অটল,
আত্মবিশ্বাস দুর্নিবার,
ত্যাগের মহিমা অমলিন,
ভাবনার উচ্চতা অনিবার,
স্বপ্নের আকাশ পাটভাঙা নীল,
জাতীয় সত্ত্বার দৃঢ়তা সুকঠিন,
আরোহণের স্পর্ধা সুউচ্চ হিমালয়,
বাঁধভাঙা বিশ্বাসের সীমানা অন্তহীন,
আত্মপরিচয়ের মগ্ন চেতনা দ্বিধাহীন,
স্বোপার্জিত বিজয়ের অনুভব অবিনশ্বর,
লাল সবুজ স্বাধীনতার ভিত্তিভুমি বাংলাদেশ ।

কাঁটাতারের স্বাধীনতা ট

- সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইখানে ই-কবরে মু ভাল অছি গ'
নিঝুম মায়ায় গুম চোহে মরণের পরে,
আজ কীসের লগে সমাধিতে ফুল
এত্ত লোকের ভিড়, এত্ত জয়ধ্বনি উ'দিকে
লাল-সবুজের ওড়না ওড়াও কীসের লগে?
কী কইলেন, আজ স্বাধীনতা দিবস বটে!
উহারে দেহি নাই, আগেই মইরা গেলম
মইরা যাই নাই, তুমরা মাইরা ফেলাইলে
মনে নাই তুহাদের সেই দিনগুলার কুথা -
যহন সমুদ্দুরের পার থাইক্যে আসা
লাল বুড়াদের সঙ্গে লড়াই কইরলম
তারপরেও পাক সেনাদের মার খাইলম
হাল ছাড়ি নাই তহনও, রক্তগঙ্গা বহে গেছে
বুকে বরফের চাঁই, নোখের ফাঁকে হাজারো সুঁইচ
কী অসহ্য যন্ত্রণা, মইরা গেলম মু
মইরবার আগে বিবিরে আমার ছিঁড়ে খাইলে পাক
রক্তধারায় শুইয়া শুইয়া চোহের পানি ফেলাইছি,
আর তারপর তুমরা মুর লাশ ছুঁইড়া দিলে
কাঁটাতারের বিশ গজ দূরে এই দ্যাশে
মুর বাপ ছিল ভারতের, মা ছিল বাংলাদ্যাশের
মাদল বাজায়ে তুমরা স্বাধীনতাট পাইলে,
যহন মুর বাপ দেহটারে কবর দিলে
খুব ইচ্ছা করছিল মুর মা'রে একবার দেহি
দেহি মুদের স্বাধীনতার রঙট কেমন
কেমন গ' স্বাধীনতা - সাদা না কালো?
কী বইলছেন, মুর নাম কী?
নামে কী আসে যায় গ' -
মুর মা'রে তুমরা দু'টুকরা কইরলে
কাঁটাতারের স্বাধীনতা দিলে মুদের,
মু আজাদ আলি, ইখানে ই-কবরে ভাল অছি গ'!

স্বাধীনতাময়

- ডঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস

স্বাধীনতা, সময়ের টানে উচ্ছলিত-
সবাকার জীবনেতে; শত অনুভব
রক্তঝরা বিভীষিকা ঢেকে! কলরব
আকাশ পথেতে ধায়, প্রাণ কল্লোলিত-
বেদনায় আত্মহারা; বিজয় শোভিত
সময় দ্বারেতে আজ-ভুলি আত্মরব,
মূল্যবোধ সাথে করি; কতই বৈভব
অনুভূতির সোপানে আজি আনন্দিত।

অবশেষে স্বপ্ন দেখা, কত আলো আজ!
মুক্তি কান্না মাঝে দেখি উন্মুক্ত আকাশ-
রক্তস্নাত এ দিগন্তে, উল্লাসের সাজ
আজিকে হৃদয় জুড়ে, যৌবন বাতাস;
স্বাধীনতা মাঝে আজ খুঁজি বারবার-
তাহারে পাবার লাগি করি অঙ্গীকার।

বাঁচতে চাই না স্বাধীনতা চাই

- শাহিন আলম সরকার

২৬ মার্চ ১৯৭১। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু তাদের আর ভোরের সূর্য দেখার সৌভাগ্য হয় নি। সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি তাদের আজ শেষ রাত; তাদের দেহ আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে গুলির আঘাতে। কেউ কিছু বুঝতে না বুঝতেই চুরমার হয়ে যায় সব। তাই ইতিহাসের পাতায় সে রাত স্মরণীয় হয়ে আছে কালোরাত হিসাবে। বাঙালি ভুলবে না কোনোদিন; মনে রাখবে হাজার হাজার যুগ ধরে।

শান্তিপুর আর সুখীপুর পাশাপাশি দু'টি গ্রাম। মাঝ খান দিয়ে বয়ে গেছে একটি গাঙ। গাঙের ধারে বিশাল একটা বট গাছ। এখানে প্রতি সপ্তাহে রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। এই হাটে কাঁচামাল ছাড়া আর কোনো কিছু পাওয়া যায় না।তাই অন্যান্য জিনিস পত্র কিনতে বালিনগর যেতে হয়।বালিনগর সেখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল এর পথ।তেমন কোন ভাল রাস্তা না থাকায় তারা গাঙের পথ ব্যবহার করে থাকে। নৌকা হচ্ছে তাদের চলাচলের এক মাত্র মাধ্যম।

স্যার বদ্বীপ রায় এই দুই গ্রামের মাথা। তার কথার বাহিরে কারও কোন কথা খাটে না এবং তার উপর দিয়ে কেউ কো্নো কথা বলেও না। গ্রামের সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে। এই গ্রামের যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে শুধু তার জন্য।

স্যার বদ্বীপ রায় নিখোঁজ। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিচিত সব জায়গায় খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। কিন্তু , কোথাও তার দেখা মিলছে না। স্ত্রী মল্লিকা রায় ও তার ছেলে মেয়ে সবাই হনহন করে খুঁজছে। গ্রামের সকল সাধারণ মানুষের চোখেও ঘুম নেই। সবারই একই ভাবনা স্যার কোথায় গেলেন। কাউকে কিছু না বলে না জানিয়ে কোথায় গেলেন। এমনটি কখন ও হয় নি। কোথাও যাওয়ার থাকলে বাড়িতে বলে যেতেন।

স্যার নিখোঁজ আজ দু'দিন হল। কারও মুখে কোনো কথা নেই ; নেই কো্নো হাসি। সবারই চিন্তা দু'দিন হয়ে গেল, এখনও স্যারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

বালিনগর থেকে ফেরার পথে, নজরুল আর সন্তোষ রায় দু'জনই স্যারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে কথা বলছেন। নৌকা চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে কারণ গাঙ কচুরিতে ভরে গেছে। সন্তোষ রায় নৌকার মাথায় বসে দু'হাত দিয়ে কচুরি সরিয়ে দিচ্ছেন। কয়েকটা কাক মাথার উপরে ঘুরছে আর কা কা কা করে ডাকছে। এমন সময় পাশ থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ ভেসে আসছে। তারা বিষয়টি খুটিয়ে দেখার জন্য নৌকা একটু বাম দিকে ঘুরান। সেখানে তারা একটা রক্তাক্ত লাশ দেখে হাও মাও করে কেঁদে ফেলে। কিছু লোক সাথে সাথে ছুটে আসে। কেউ লাশটি চিনতে পারছে না।মুখে এমন ভাবে আঘাত করা হয়েছে যে চেনার উপায় নেই।

লাশ গাঙের ধারে ওঠানো হলে; চারদিক থেকে লোক এসে ভিড় করে। কেউ লাশটি চিনতে পারে না। তবুও কেন জানি, চোখের অশ্রু জলে সবার বুক ভেসে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে সব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে শুধু কান্নার আওয়াজ।

লাশের গায়ে লেখা - বাঁচতে চাই না স্বাধীনতা চাই।

আলোর পথের কান্ডারি

- মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন

পরাধীতার অন্ধকারে
ঢুবে ছিল যখন জাতি "
কেহ পারেনি জ্বালাতে '
স্বাধীনতার একটি বাতি।
তুমি সেদিন জ্বেলে ছিলে আলো।
করেছিলে বজ্রকণ্ঠে ভাষন "
জাতিকে তুমি দেখিয়েছিলে পথ।
দিয়েছিলে স্বাধীনতার ভাষণ
হে আলোর পথের কান্ডারি "
আলো জ্বালিয়েছিলে তুমি।
তোমায় পেয়ে ধন্য হয়েছে এ ভুমি।
তুমি জ্বেলেছ আশার আলো।
দেখিয়েছ স্বাধীনতা কাকে বলে।
তোমার জন্য বাংলাদেশ পেল
স্বাধীনতার পতাকা।
তুমিই পতাকা,
তুমিই বাংলাদেশ,
তুমি ছিলে না তাই একা "
তোমার সাথে ছিল পুরো বাংলা "
ছিল বাংলা মায়ের হাজার সন্তান
তাই তুমি মহান "
হে বাংলার বাঘ
শেখ মুজিবুর রহমান। —
তুমি ছিলে আশা,
তুমি ছিলে বাঙালির ভরসা,
তুমি ছিলে তরুণের ঝলসে ওঠা রক্ত,
ঝলসে ওঠা বিদ্রোহী প্রাণ,
গর্জে ওঠা বিদ্রোহী প্রাণ,
কৃষকের রক্তে ভেজা ঘাম,
লাখো জনতার হৃদযন্ত্রের স্পন্দন,
তুমি ছিলে,
মায়ের সাথে ছেলের রক্তের বন্ধন।
সে তোমার বাংলা, মা।
লাখো শহিদের রক্তে ভেজা মাটি,
তুমি ছিলে সব ছিল,
তুমি নেই কিছু নেই,
তুমি ছিলে,
পৃথিবীর বুকে একটা মানচিত্র,
একটা সোনার বাংলা ,
একটা প্রাণ যা ভালবাসাতে ভরপুর।
তুমি ছিলে ,
স্বাধীনতার ডাক দিলে,
মুক্তির ডাক দিলে,
দিয়েছিলে মানুষেরে অধিকার।

রুখবো এবার শকুনের থাবা

- মোঃ নিজাম গাজী

আমার বাংলায় শকুন থাবা দিয়েছে
হত্যা করছে আমার বাংলার মানুষকে,
আমি যুবক কি বসে থাকবো,
কী বলে তোমাদের বিবেকে?
না,না,না আমি বসে থাকবো না ।
অত্যাচারী শকুনদের আমি ধ্বংস করবো বাবা ।
দোহাই লাগে মা
তুমি আমায় বাধা দিওনা ।
শকুনদের ঐ মেশিনগানের চেয়ে আমার এই বাঁশের লাঠি যে ভয়ঙ্কর ।
দোয়া করো মা আমি ফিরে আসবো আবার ।।
মাথায় আমার জন্মভূমির পতাকা
জানি আমার এই যুদ্ধ যাবে নাকো কখনও বৃথা ।।
দীর্ঘ মাস যুদ্ধ করলাম আহত হলাম বারবার,
প্রাণ থাকতে শকুনদের রুখবো আমি হাজার বার ।।
যুদ্ধের এই ময়দানে তোমাদের খুব বেশি মনে পরে মা-বাবা,
দোয়া করো তোমরা-
রুখবো আমি ঐ শকুনদের থাবা ।।

স্বাধীনতা অতি প্রিয়

- মোঃ সানাউল্লাহ্

রক্তের দামে কিনেছি মুক্তি,
আনিয়াছি স্বাধীনতা;
ভুল করে কেউ করিও না ভুল
মানবো না অধীনতা!

এই দেহে আছে যতদিন প্রাণ
বলবো দেশের কথা,
ভাল যদি তব নাহি লাগে তবে
ততোধিক দিও ব্যথা!

সাগর সেচিয়া এনেছি মুক্তো
রাখিও যতন করে,
অবহেলা করে হারাইওনা তারে
কাঁদবে জীবন ভরে!

রঙ বদলের খেলা দেখে হই
শঙ্কিত অবিরত!
দেশের মাটিকে ধরিও না বাজি
বাড়াইওনা আর ক্ষত!

মিলে ঝুলে জ্বালো সুখের প্রদীপ
নিভিতে দিও না তারে,
দুর্গম পথে থাকিও অটল
বুক পেতে দিও ঝড়ে!

স্বাধীনতার সূর্যোদয়

- অজিত কুমার কর

কেউ এই দিনটিকে ভুলে যেয়ো নাকো
দেশকে বাঁচাতে যারা দিয়ে গেল প্রাণ
হটেনি কেউই পিছু বাঁধা হল ম্লান ।
পরিশেষে স্বাধীনতা স্মৃতি ধরে রাখো
প্রণাম জানাতে এসো যে যেখানে থাকো।
রজনি প্রভাত হল চতুর্দিকে আলো
মনের কালিমা মুছে দীপমালা জ্বালো
শহিদবেদিতে আজ পুষ্পমালা রাখো।

জননী বিপদগ্রস্ত কে আছো কোথায়
থেকো না অলস হয়ে আগুয়ান হও
নিজেরে উদ্দীপ্ত করো অক্ষম তো নও
বিপন্নতা কাটাতে মা সহায়তা চায়।
বাঙালিরা কখনোই মানে না তো হার
বিজয়সেনানী-গলে দোলে মণিহার।

আমরা বীরাঙ্গনা বলছি

- মোনায়েম সাহিত্য

আমি সূর্য বানু
বয়সের ভারে নতজানু
তোমাদের মাঝে হয়নি কোনো ঠাঁই
রাস্তার ধারেই শুয়ে থাকি, ভাঙা চুলোয় রেঁধে দুমুঠো খাই।
পায়ে নেই বল, গায়ের শক্তি হয়ে গেছে ক্ষয়,
ভুগি রোগে-শোকে, লাগে এখনও লোকলজ্জার ভয়।
ভাঙা ঘরে জ্বলে শুধু প্রদীপের মিটিমিটি আলো,
কেউ আসে না দেখতে, আমি কতটা আছি ভালো!

সত্তর পেরিয়ে গেছি কবে,
কবে যে মরণযাত্রা শুরু হবে!
চোখ, কান, হাত, পা, সব যেন শেষ।
আমার জীবনে নেই এতটুকু ভালো থাকার রেশ।
অনাহারে-অর্ধাহারে পড়ে থাকি একা,
স্বামী গেছে ছেড়ে ওই পরপারে,
দুঃখ বেদনা যেন নিয়তির লেখা।
সব হারিয়ে শুধু কলঙ্কিনী আমি আয়মনা
শয্যাশায়ী আমি, করি মৃত্যুই কামনা।

সংসার বলে কাকে বুঝিনি তখনও
কোমল হাতে পরেছি লাল নীল চুরি
কোথা থেকে এলো সব শুকুন যে উড়ি
চোখের পানিতে ঢাকি সেই লজ্জা এখনও।
কেউ শুনেনা আমার সে কষ্টের বাণী,
আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদি আমি চম্পা রানী।

তরুণী আয়েশা আমি
স্বপ্ন ছিল কত!
সুখের সংসার হবে এক
ভাবি অবিরত।
সব আশা ভেঙে গেল, সব মনোবল,
আমায় লুটিয়ে নিল হায়েনার দল।
স্বামী ছাড়া, দিশেহারা, করবো কী যে আমি!
শেষ জীবনে কী আর হবে, জানেন অন্তর্যামী।

চৌদ্দ বছরে আমি, চপলা, চঞ্চলা ছোট জয়গুন,
আমায় পুড়িয়ে করে গেছে ছাই,
সম্ভ্রম সে হারিয়েছি কবে!
সবার মাঝে থেকে বাঁচবার অধিকারও নাই।
দুচোখে আসে না ঘুম, থেকে থেকে লাগে শুধু ভয়,
মানুষ কখনও এমন হিংস্র হয়?
নির্মম যা ঘটেছিল সেই চুয়াল্লিশ বছর আগে
এখনও তা ভেবে ভেবে কত ঘৃণা জাগে!

চৈত্রের কোন এক পরন্ত দুপুরে
ঘর ছিল, সংসার ছিল, স্বামী গিয়েছিল কাজে,
ছোট শিশুটা ছিল শুয়ে বিছানার উপরে,
স্নান করতে গেছি ঘর-ঘেঁষো পুকুরে,
আমায় যে শেষ করে দিল মনুষ্য কুকুরে।
সব শুনে স্বামী হল বাকহারা লজ্জায়,
নিজেরে ঢলিয়ে দিল তার শেষ শয্যায়।
গ্রাম ছাড়া, সমাজ ছাড়া, কাটাই আজ দিনক্ষণ,
মরে যেন বেঁচে আছি কলঙ্কিনী করিমন।

কান্নাই বুঝি পাওনা ছিল,
দুচোখ ভরে জলে, করে ছলছল
আমি তো অমানুষ এক,
মানুষের সমাজে আমাকে জায়গা কে দেবে বলো?
তোমরা পেয়েছো দেশ,
সবে মিলে আছো বেশ!
আমার'তো সম্ভ্রমটুকুও নাই,
আমারও সব ছিল,
স্বামী ছিল, সংসার ছিল, ছোটো এক সন্তানও ছিল।
কোথা থেকে নরপশু এসে সব যে লণ্ডভণ্ড করে দিল।
একাত্তরের দুপুরে সেই যে নেমেছে দুর্ভাগ্যের কালো
আমাকে করেছে শেষ, কখনও থাকতে দেয়নি ভালো।
'ষাট পেরিয়ে গেছি, কিছু সাহায্য কর আমায়, রহিমা আমার নাম,'
এ কথা বলতে গেলে লোকে বলে, "ওহ তুই! ওরে পোড়ামুখি থাম!'
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা শুধু আস্টে পিষ্টে ধরে,
পেটে যে ক্ষুধার জ্বালা, কবে যাবো মরে?

সেদিন ছিল উঠোন ভরা রোদ,
মায়ের সাথে বসে করছিনু রান্না,
কী যে হয়ে গেলো! শুধু চোখে ছিল কান্না।
কিশোর বয়স ছিল, চঞ্চলতাও ছিল,
চোখের পলকে যেন সব ছাই করে দিল।
মাকেও তুলে নিয়ে গেলো,
বন্দুকের মুখে জীবন দিল মোর বৃদ্ধ বাপ,
এখনও বয়ে বেড়াই আমি সেই কালো অভিশাপ।
গ্রামে গ্রামে কাপড় বেচি, খাদ্যও তো চাই।
নিজেরে নিজেই দেখি, দেখার তো কেউ নাই।
স্বাধীন দেশেও বলো কী বা আর পানু?
তাই এক কোণেতে পড়ে থাকি সব হারানো ভানু।

সেই তো একাত্তরে আমি সম্ভ্রম হারিয়েছি,
আজ আমি ঘরে ঘরে কাজ করার ঝি।
কখনও কখনও মিলে বসে সুতা কাটি।
হায়েনার দল এ জীবন করে দিছে মাটি।
কম মারেনি স্বামী আর সৎ ছেলে মেয়ে,
এখনও তো বেঁচে আছি এক-দু বেলা খেয়ে।
শরীরে রোগ দানা বেঁধে ভুগি আমি শোকে,
নুরজাহানটা কেমন আছে, তা ভাবে না লোকে।

তালাবদ্ধ দুয়ারখানি লাথি মেরে খুলে
হানাদারের পাষণ্ডরা নিয়ে গেল তুলে।
মানটুকুও গেলো চলে, সব হারালাম আমি,
আমারে একা ফেলে চলে গেলো স্বামী।
কেন যে মুখে তুলে নেইনি বিষদানী
এ সমাজেই রয়ে গেছি ধরে প্রাণখানি।
হাসিনা বেগমের ভাগ্যে ঘোরে কষ্টের যাতা,
হাত বাড়িয়ে বসে থাকি, পাবো কি আমি বিধবা ভাতা?

একাত্তর নিয়ে গেছে সব, দিয়ে গেছে কালি,
আজ হামিদার চার পাশ জনশুণ্য, খালি।
দুবেলা দুমুঠো খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা,
রোগে ভুগি, কোথায় পাবো ঔষধের টাকা?
ডোগি ডোগি করেই হয়তো কিছু টাকা পাই,
স্বামী সন্তানহীনা আমি শুধু কেঁদে যাই।
কেউ তো আসে না নিতে এই হামিদার খবর,
মরে গেলে এসো সবে, দিয়ে যেও কবর।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
আমি তো সম্ভ্রমহারা, জীবন কাটে কীর্তন করে।
স্বামী হয়েছে গত, আছে তিন ছেলে মেয়ে,
লজ্জা ঢাকে তারাও আমি থেকে দূরে যেয়ে।
আমি আর তবলা-ডুগি, ঘরেতে দিয়েছি তালা,
কী করে যে বেঁচে আছি, তা জানে এই রাজুবালা।

পশুর দলে সদলবলে ক্যামনে জানি এলো
পায়ে পিষে জীবনটারে ভস্ম বানায় গেলো।
গুলি দিলো স্বামীর বুকে,
আগুন দিলো আমার সুখে,
সব হারিয়ে জীবন আমার শুধু এলোমেলো।
এই হাজেরার দিন যে কাটে লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে,
মরণ বুঝি এসেই গেলো, গেছি কত বুড়িয়ে!

শক্ত হাতের ধাক্কা বুঝে দুয়ার দিলাম খুলি
সবকিছু তো লুটেই নিল, করলো আবার গুলি।
এখনও সেই গুলি আমি বই যে আমার শরীরে,
দু চোখ বেয়ে অশ্রু নামে, কখন যে যাই মরি রে।
ছয়টা টিনের ঝুপড়ি ঘরে কষ্টে আছি বাঁচিয়া,
ধুঁকে ধুঁকে আর কতদিন বাঁচবে বৃদ্ধা আছিয়া?

সূর্য উঠার আগেই আমি উঠি,
চেয়ারম্যানের বাড়ি যাই ছুটি,
এ সমাজে সবাই আমাকে করে হেলা,
কাজ না করলে খাবার জোটে না দু'বেলা।
শরীর চলে না আর, তবু কাজে আমি থামি না।
এভাবেই বেঁচে আছি, সব হারানো সামিনা।

সে দিনের ভয়াল স্মৃতি
আমার পেছনে আজও যেন ছোটে,
স্বামীকে বেঁধে রেখে
আমার উপরে নরপশুদের সেই নির্যাতনের কথা ভাবলেই
বুকটা ধরফর করে ওঠে।
এ লজ্জা ঢাকবো কিসে?
কষ্ট যে ধরেছে পিষে।
সে যন্ত্রণা কি করে যাই ভুলি?
দুঃখে কষ্টে বাঁচি সুরাইয়া বেগম ধুলি।

ঝুপড়ি ঘরে একলা থাকি, শরীরটাও যে শীর্ণ,
তিনটা টিনের ঘরের ভিতর জীবন বড় জীর্ণ।
রোগে-শোকে, অর্ধাহারে দিন কাটে না, বাবা।
কেউ কি আমার মরার তরে বিষটা দিয়া যাবা?
কমলা বানুর জীবনটা যে হয়ে গেছে ছাই,
লোকলজ্জার ভয়ে বলো, কোন দিকেতে যাই?
স্বাধীন দেশের মানুষগুলাও ক্যামনে এমন হয়?
এখন খালি মরণ ছাড়া চাওয়া কিছু নয়।

জ্বলেছি সেই একাত্তরে
এখনও তো জলছি।
শেষ বেলাতে মাথা তোলার সম্মানটুকু দাও,
কেউ কি এ আকুতি শুনতেও না পাও?
ছেচল্লিশ বছর পরেও
কেন এতো জ্বলছি?
আমরা বঙ্গকন্যা, বঙ্গমাতা, বীরাঙ্গনা বলছি।

কচুরিপানার ডকুমেন্টারি

- সাকিব জামাল

নরেন বৈরাগীর বাড়ির পাশে
ছিল একটি পঁচা জলের ডোবা
সেথায় এই কচুরিপানা আমি
আমার অন্য সহোদরদের নিয়ে
উঠেছিলাম বেড়ে ।
একাত্তরের কোনো এক দিনে
সেই নরেন বৈরাগীর বাড়ি
এসেছিল খাকি পোশাক পরা
একদল পাক মেলেটারি
অস্ত্র নিয়ে তেড়ে ।

দুই কোলে দুই খোকা নিয়ে
নেমে নরেন এই জলের ডোবায়
আমাদেরকে মাথায় দিয়ে তারা
একটু বাঁচার আশায়
সেজেছিল জংলি মহিষের পাল ।
এমন সময় জলের কলশ নিয়ে
বাড়ি ফেরে বৈরাগীর বউ
দেখে তারে কাল্লু রাজাকার উঠলো বলে
'দে সোনা তোর ফুলের মৌ
ইয়ে আওরাত কামাল ।'

শুনে তা হিংস্র পশুর দল
উঁচিয়ে বন্ধুক আর অট্টহাসি দিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর
তখন আমার নিচে লুকিয়ে থাকা
ছোট্ট খোকা দিল চিৎকার ।
অমনি হল শুরু গুলি
গেল চলে চার তাজা প্রাণ
আর আহত আমি কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম
' হে সৃষ্টিকর্তা, হোক ধ্বংস এই পাকিস্তান
জয় হোক সংগ্রামী জয় বাংলার ।'

কোথায় স্বাধীনতা

- মৌটুসি মিত্র গুহ

স্বাধীন দেশেতে আমি খুঁজে ফিরি স্বাধীনতা
প্রতিদিন যে দেশে চুরি যায় মানবতা!
দেশটা স্বাধীন তাই ঘুমিয়ে যে চেতনা
বেঁধে দেয় কারা যেন মূল্যবোধের সীমানা।
নারীদের সম্ভ্রম খুঁজে ফেরে স্বাধীনতা
সভ্যতা চুরি করে উচ্ছৃঙ্খলতা!
সোচ্চার কণ্ঠ যদি চায় স্বাধীনতা
চিরতরে হারাবে সে বাচনের ক্ষমতা!
নিয়মের বেড়াজালে বন্দী যে লেখনী
বাড়াবাড়ি হলে ওরা ভেঙে দেবে তখনি!
শিক্ষার অধিকারও বিত্তের দখলে
মিলবে শিক্ষা ভালো পকেটটা ভারী হলে!
স্বাধীন দেশটি ভরা অভুক্ত অভাগাতে
পারল কি স্বাধীনতা সেই জ্বালা মেটাতে!
পথশিশু খুঁজে ফেরে শৈশব স্বাধীনতা
গরিবের তরে দেশে আছে শুধু শত ব্যথা!
স্বাধীনতা থাকে তবু বিত্তশালীর পাশে
অন্যায় অবিচার ঘটে চলে অনায়াসে!
উৎসবে মাতি সবে স্বাধীনতা দিবসে
শেখা বুলি মেখে নিয়ে দেশভক্তির সুবাসে!
দেশ তো স্বাধীন তবু কেন খুঁজি স্বাধীনতা
সবই তো আছে তবু কেন এই শূন্যতা?

প্রার্থনা

- রিঙ্কু রায়

ত্রিশ বছর চুরি গেছে, দেখিনি আমি তোরে।
আজ নিরালায় লিখছি তাই, পত্রখানি ভরে।
যন্ত্রণার ওই ঝড়টা বুকে, দুমড়ে মুচড়ে দেয়।
মোর হৃদয়ের গোপন কথা, জেলের ধুলোয় লুটায়।

জানি মা খুঁজেছিলি, কুয়াশা ভরা ভোরে!
খুঁজিস বুঝি আজও মোরে, পাথর চোখের পরে!
যেদিন আমি হারিয়ে গেলাম কাঁটাতারের ফাঁকে,
তোর মুখটাই বুকের মাঝে, ডুকরে ওঠে কেঁদে।

ইচ্ছে করে যাইনি আমি, তোকে রেখে একা।
কেমন করে হৃদয়ে মোর, পড়লো পাথর চাপা।
আজকে আমি লিখছি মা'রে, তিনটে যুগ পরে।
কি জানি বোধহয় হারিয়ে গেছিস, নেইতো আজ ঘরে!

এই দেশের জেলের থেকে, মুক্তি আমি পাব।
তোকে দেখার জন্য ব্যাকুল, চক্ষু হৃদয় তব!
বুকের মাঝে শঙ্কা হয় বেঁচে আছিস কিনা!
ঠিকানাটাও ভুলে গেছি, সব যেন অচেনা।

চেনা যেন তোরই মুখ, তোর আদর স্নেহ।
বাকিটা সব চুরি করেছে, কালো রাত্রির কেহ!
মোর যৌবন মোর দুপুর, ধুলায় রইল ঢাকা!
জানি না কোন দোষে আজ, সব কিছু যে ফাঁকা।

তৃষিতএ বুকের মাঝে, তেরঙা আজও উড়ছে।
চিনতে মোরে পারবেনা কেউ,চোখে স্মৃতি ভরছে।
তখন ছিল দেহে যৌবন, আজ সন্ধ্যার শেষে,
মোদের ছোট্ট ছোট্ট স্বপ্ন কোথায় গেল ভেসে!

পৃথিবী যখন সুখ নিদ্রায়, মোর জন্য জাগিস,
বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে, মোরে বুঝি খুঁজিস।
বেঁচে থাকলে ধুলোর মাঝে প্রতীক্ষা করবি একা।
কেমনে দেব তার প্রতিদান, রেখে গেলে একা।

তোর জন্য এতটা কাল, জেগে আমি রই,
তোর জন্য প্রতিদিন মৃত্যুতেও বেঁচে রই।
স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তোকে ঘিরে রয়।
বুক চিরলে দেখবি তোকেই, স্বার্থপর নই।

আবেগে মোর হৃদয়খানা থরথর করে কাঁপে,
কাঁদবো ফিরে মা ছেলেতে বুকের মধ্যে চেপে।
যাসনা মা'রে ছেড়ে তুই, এইটুকু শুধু প্রার্থনা,
বড়ো আশায় ফিরছি ঘরে, নিরাশ তুই করিসনা।

জয় বাংলা

- গোলাম রহমান

স্বাধীনতা আমার দারুণ অহংকার!
স্বাধীনতা আমার রক্তে প্রচণ্ড উন্মাদনা!
স্বাধীনতা ভয়ঙ্কর রক্তের হোলিখেলা!
স্বাধীনতা আগুনের গোলা বুকে চেপে ধরা!
স্বাধীনতা নয়, ছেলের হাতের মোয়া!
স্বাধীনতা আমার বেঁচে থাকার অধিকার!

আমি উনসত্তর দেখেছি
উত্তাল জনতার জোয়ার!
আমি সত্তর দেখেছি
জনতার চাওয়ার অধিকার!

আমি একাত্তরের ৭ই মার্চ দেখেছি
রেসকোর্স ময়দানে জনতার জোয়ার;
শুনেছি মহানায়কের বজ্রকণ্ঠের
দৃপ্ত উচ্চারণ " এবারের সংগ্রাম,
স্বাধীনতার সংগ্রাম....."!
শুনেছি বাঙালির জাগরণের অমর বাণী "জয়বাংলা"!!

স্বাধীনতা

- অনুপ মজুমদার

স্বাধীনতা! আহা কি সুন্দর কথা!
কষ্ট করে পাওয়া বড় অমূল্যধন
অযুত প্রাণের বলিষ্ঠ পণ
জীবন করেছিল দান অমৃতক্ষণে।

স্বাধীনতা! সে যে বেলা-অবেলায় ইচ্ছেমতো
জীবন ছোঁয়া স্বপ্ন মধুময়,
ঘরে ঘরে পরম শান্তিগাঁথা
গৃহবধূর ভালোবাসায় আঁকা নকশিকাঁথা;
সে যে উচ্ছ্বসিত আবেগে ভরা
বিন্দু বিন্দু শিশির সিক্ত ধানখেতে সোনালি কবিতা;
সে যে অপূর্ব মনোরমা জলতরঙ্গে
দাঁড়ের ছন্দে মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি সংগীত!

স্বাধীনতা - হয়েছিল সে বন্দী
অধীনতার বেড়াজালে
শোষকের পদতলে,
সারা দেশ জুড়ে পিশাচের তান্ডব
ধূলায় লুণ্ঠিত চেতনা
নিগৃহীতা অন্নপূর্ণা
চারিদিকে বঞ্চণা, ক্ষুধা, চাপা কান্না
দেশ আমার ভীত, দুই চোখ ছিল তার সদা জলে ভরা!

সহ্য হল না আর জননীর অপমান
গর্জে এল বজ্রকণ্ঠ -
আর নয়
"এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"
বিজয়ের লক্ষ্যে
হে দেশবাসী হও সম্মিলত, হও আগুয়ান!

তারপর?

রচিত হয়েছে অমর ইতিহাস,
তেজদীপ্ত অসমসাহসী গৌরবগাঁথা;
আকাশের বুকে উড়েছে নির্ভীক লাল সূর্যের সবুজ পতাকা -
'জয় বাংলা, বাংলার জয়';
অপ্রতিরোধ্য মুক্তি সংগ্রামে
ঘটেছে শত্রুর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

রক্তরঞ্জিত ত্যাগসিঞ্চিত মুক্তিযুদ্ধে মধুর সে বিজয় সুমহান,
স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! আমরা সকলে বিহঙ্গ এখন, মুক্ত-স্বাধীন!

জ্বলে ওঠে দীপশিখা

- জয়শ্রী রায় মৈত্র

ভেজানো দ্বার প্রান্তে
অনুভূতির সোপানে
শিশির ভেজা গোলাপের ঘ্রাণ-
জ্বলে ওঠে দীপশিখা,
ঘন অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভেদ করে
মনের চিরন্তন ভাবনাগুলো
ফুটে ওঠে শতদলের শত পাপড়ি হয়ে
জ্বলে ওঠে দীপশিখা,
প্রত্যাশা ছুঁয়ে দেখার বাসনায়
হৃদয় পিঞ্জর গুমরে ওঠে
না বলা কত কথার ঝড়ে
জ্বলে ওঠে দীপশিখা,
ছলছল চোখে লুকোচুরি খেলে মন্দ সমীরণ
আলতো করস্পর্শে খুলে যায়
বাতায়নের দ্বার
জ্বলে ওঠে দীপশিখা ।।

স্বাধীনতা তোমার জন্য

- পলাশ দেবনাথ

তোমার জন্য ঝড়েছে রক্ত
হারিয়েছে কতজন প্রাণ,
অশ্রু মাখা চোখে দেখিছে স্বপ্ন
কণ্ঠে গেয়েছে বিজয়ের গান।

তোমার জন্য নয়মাস যুদ্ধে
পেয়েছি স্বাধীন পতাকা,
স্মৃতি বিজরিত লাল সবুজে
রয়েছে শহিদের স্বপ্ন মাখা।

একটি আশা বুকে নিয়ে
সহেছে বাঙালি কত ব্যথা,
বাঁচার জন্য বেশ কিছু নয়
প্রয়োজন ছিল একটু স্বাধীনতা।

দস্যুদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরে
হয়েছি আজ ধন্য,
আজ আমরা মুক্ত স্বাধীন
হে স্বাধীনতা তোমার জন্য।

পতাকা

- মোবারক হোসেন

আমি একাত্তর দেখিনি,
জন্মে দেখেছি বাংলাদেশ
আর লাল সবুজের পতাকা ।
যার বাহিরে স্বাধীনতা
বিস্ময় চোখে মায়ের হাসি,
ভিতরে শহিদের রক্ত স্নান
রক্ত গোলাপ প্রতিদান।
সব মিলিয়ে এই পতাকা
দীপ্ত মাটির টান !
এই পতাকা জন্মভূমির
গৌরব ও সন্মান।

স্বাধীনতার স্বরূপ

- সুহেল ইবনে ইসহাক

স্বাধীনতা তুমি, ফসলের মাঠে শিশিরের জলরাশি ,
জয় উল্লাস নীরবতা ভেঙে দেওয়া হৃদয়ের নাচ ,
দিগন্ত জোড়া সবুজের সুখ, বুকে নিয়ে হাসে ধরা ।

স্বাধীনতা তুমি, দু'লক্ষ মা বোনের দীর্ঘদিনের কান্নার সমাপ্তি,
সাত কোটি বাঙালির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন,
প্রভাতি সুরে বিজয়ের গান ।
ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকা জাতির সূর্যোদয়,

স্বাধীনতা তুমি, সুরমা, মনু আর কুশিয়ারা নদীতে
সুজন মাঝির নায়ে
হাওয়ায় উড়ানো পাল ।
দাঁড় বেয়ে চলা নৌকা,লাঙলের ফলায় উর্বর মাটি,
সোনালি ধানের শিষে বহে চলা এক শোণিত মলয় ।

আমার স্বাধীনতা

- তুহিন আহমেদ

স্বাধীনতা!
নিজের ইচ্ছা অভিলাষ
নিজের কাম্যতা,
অন্যের প্রাপ্যতা, মূল্যহীন হেথা
এরই নাম
তোমার নয়, নয় সর্বজনীন
এ আমার স্বাধীনতা।
তাইত নিত্য
সাধুকে সাজাই ভন্ড, ভন্ডকে দেবতা।
অন্যের স্বাধীনতা হরণই আজ,
আমার স্বাধীনতা।

মুক্তি

- শ্রী সৌমেন চৌধুরী

স্বাধীনতা আছে রক্তে মিশে
স্বাধীনতা আছে মনে
স্বাধীনতা আছে হৃদয় জুড়ে
উদ্দাম যৌবনে।

শোষণহীন হবে সমাজ
সবাই পাবে খেতে,
শিশু-শ্রম বন্ধ হবে!
তারা খেলবে আনন্দেতে।

সবার জন্য শিক্ষা হবে,
থাকবে সবার ঘর,
সুরক্ষিত জনজীবন আর
কর্মসংস্থান বরাবর।

ছাড়বে সবাই হিংসা-দ্বেষ
বন্ধ হবে হানাহানি,
পৃথিবী হবে মুক্ত সেদিন,
থামবে কাঁটাতারের হয়রানি।

সাধের স্বাধীনতা আমার

- অনিরুদ্ধ বুলবুল

তোমার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর কভু
ফুরাবে না জানি, এখনো যে মাঠে দেখি শুধু হানাহানি?
নিঝুম রাতের প্রহর জুড়ে
আধোঘুম জাগরণে শুনি – এ কি কানাকানি!

এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে
চেয়ে আছি চাতক পাখির মত
ইতিউতি খুঁজে ফিরি নীলিমার নীলে -
স্বাধীনতা কবে মোর হবে অধিগত?

প্রতীক্ষার এ প্রহর ক্রমে হয় আরো দীর্ঘতর,
পেরোতে পারি না বাঁধা, বাঁকে জাগে কালস্রোত
বারবার ঢেউ উঠে, হাল ভাঙে – হায় রে;
তরী বুঝি ডুবুচরে ঠেকে ঠেকে যায় রে!

সাধ জাগা ভাল লাগে যদি ঠাঁই পায়,
শকুনে খেয়েছে আগেও,
এখনো যে খায়; সে আমারই ভাই?
কারো দেখি ঘটে না; ভাগ্যেতে কিছু
সুযোগ পেলেই দেখি - শ্বাপদেরা মাথা করে উঁচু
আর; আমাদের মাথা সদা হয়ে থাকে নিচু।

একটি কালো রাতের গল্প

- মৃন্ময়

একটি গভীর কালো রাতও যদি এসে যায়-
তবে তাও জেগে থাকে ভোরের আলোর প্রতীক্ষায়-
দুর্নিবার ।
আমরাও জেগে থাকি অনিবার-
বারবার স্বপ্নে জেগে উঠি,
একটি কালো রাতের গল্প শোনাবো বলে।

পুড়ে যাওয়া দেওয়ালে কান পেতে থেকো-
হাড় জ্বালা করা আগুনের সঙ্গম শব্দ
শুনতে পাবে।

কালো রাতের গল্পটা লুকিয়ে আছে ওখানে,
২৫শের কালো রাত-
ঘুমিয়ে আছে ঐ গভীর অন্ধকারে।

রক্তস্নাত হয়ে তারপর...
জেগে উঠেছে সূর্য-
এক নতুন দিগন্তের উল্লাসে,
গতরাতের ক্ষত মুছে-
বন্ধনহীন বাতাসে।

স্বাধীনতা পাওয়া

- ছবি আনসারী

স্বাধীনতা নয় কেবল চারটি বর্ণের জোড়া
এ যেন হৃৎপিন্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ
এই প্রকোষ্ঠ জুড়ে আছে লেখা ;
বাঙালির শোষণের ইতিকথা
আমার ভাইয়ের শার্টটি রক্তে রাঙা !

রয়েছে দীর্ঘ ত্যাগ আর তিতিক্ষার কণ্ঠকমালা
শাসনের অক্টোপাস ,শোষণের নাগপাশ যা ;
হয়নি সহজে ছেঁড়া
স্বাধীনতা হয়নি সহজে পাওয়া !

স্বাধীনতা শব্দটিকে আপন করে পাওয়ার জন্যে
উৎসর্গ হল ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ
২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে
বাংলার ঘর হল শ্মশান ,
বোনের ইজ্জত হল লুট ।
বাংলা হল রণক্ষেত্র ;
৭ কোটি বাঙালির সুখের প্রদীপ
হারিয়ে গেল !

২৬ শে মার্চ মধ্য রাতে এক ভরাট কণ্ঠে
স্বাধীনতার ঘোষণা এলো ;
'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো '
ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা সেই অমিয় ডাকে !

অতঃপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো !
আকাশে লাল সূর্য উদিত হল
আপন হয়ে পতাকা উড়ল পতপত
আমরা স্বাধীন হলাম
৯টি মাস যেন ৯শ বছরে শেষ হল !

এ স্বাধীনতা হয়নি সহজে পাওয়া
এ স্বাধীনতা অনেক দামে কেনা !

এ 'স্বাধীনতা' অভিধানের শুধুই একটি শব্দ না !
এটি রক্তের কাঁপন ,বাঙালির প্রেরণা
শিরদাঁড়া উঁচু করে দাঁড়াতে শেখা
বুকে বুলেট ,তবু দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাওয়া !

এ স্বাধীনতা মানে -বন্দি খাঁচা ভেঙে ফেলা
নীল আকাশে উড়ে বেড়াই
আমি মুক্ত বলাকা ;
আমি মেঘে মেঘে বলি মনের কথা
আমার নেইতো কোন বাঁধা ।।

তবুও অভিমান ?

- এম ওয়াসিক আলি

সাজানো বাগানে আজ প্রস্ফুটিত ফুলের দল
তোমার স্পর্শের ছোঁয়ায় বিগলিত সকল
ভ্রমরের সুমধুর ডাকে কানন বিবশ
তবুও অভিমান?
মনের কোণে লুকিয়ে একরাশ ক্লেশ
তুমি চলে যাবে কার উপর অভিমানে?
তারা কি বোঝে পরাধীনতার ব্যথা?
যেও, বাঁধার সম্মুখীন হবে না
কিন্তু ভেবে দেখো একটিবার
যে পথে একা একা চলেছো তুমি
অনেক পথ পার করেছো একাকী
ফিরে দেখো একা নও তুমি
তোমার মতো অনেক বীরের রক্তে
রঞ্জিত হয়েছে দেশের মাটি, তারাও কি অভিমানী?
তোমার মতো অনেক বীরের মা'য়েদের
চোখের জল এখনও বিদ্যমান
ভুলে গেছ?
দেশের গর্বের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা তোমার নামখানি
তবুও অভিমান, চলে যেতে চাও?
ফিরে দেখ তোমার ভালবাসায়
পথ অবরুদ্ধে শায়িত এক মস্ত বহর
পারবে পা মাড়িয়ে তাদের ভালবাসায় আঘাত দিয়ে চলে যেতে?

একটি প্রশ্ন

- মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান

একটি পতাকা
একটি মানচিত্র
একটি ভাষা
সব মিলিয়ে একটি স্বপ্ন।
এই স্বপ্ন মাছেভাতে তুষ্ট বাঙালির
একটি স্বাধীন বাংলাদেশ।

অথচ এই বাংলাদেশে
আমার সন্তানেরা আজো শিক্ষাঙ্গনে
গুলি খেয়ে মরে।
গুম, খুন, নারী ধর্ষণের খবরে
পত্রিকার পাতা ভরে।
রেললাইনের বস্তিতে নরকের কীট হয়ে
বেড়ে ওঠে শিশু।
ভোট ও ভাতের অধিকার হরণ
কলেজ ছাত্র লিমনের পা হরণের মতো কত সহজ!
গণতন্ত্র, মানবাধিকার শব্দগুলো যেন
থার্ড ব্র্যাকেটে বন্দি।

সীমান্তে ফেলানির লাশ ঝুলে কাঁটাতারে
যেন এক জীবন্ত পোস্টার।
সারের দাবিতে গুলিখেয়ে কৃষকের পাঁজর ভাঙে
বাসের জানালায় পেট্রোল বোমা শ্রমিককে
পুড়িয়ে ছাই করে।
তাহলে আমি কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম
যে বাংলাদেশের জন্য স্বপ্নে বিভোর
প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ?

সোনার দেশ বাংলাদেশ

- জয়শ্রী কর

ভাইবোনের রক্তে রাঙা স্বাধীনতা-দিন
আমরা পালন করি
ভেদাভেদ ভুলে একযোগে সবে
নিশান তুলে ধরি।

দেশমাতার মান রক্ষায় দিল যারা
আত্মবলিদান
যায়নি বৃথা, ধ্বনিত হাজারো কণ্ঠে
সমস্বরে জয়গান।

লাল হয়েছিল দেশমাতৃকার মাটি
মনে প্রমাদ গণি
অকালেই গেল ঝরে কত শত কুঁড়ি
মা'র নয়নের মণি।

সবুজের বুকে সূর্য, ওড়ে পতপত
কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে
লেখা আছে নাম বিপ্লবীবীরদের
রক্তের অক্ষরে।

ধন্য আমরা নমস্য ওরা স্মরি অবদান
নম্রতায় এক্ষণে
শহিদবেদিতে মালা দিয়ে জানাই শ্রদ্ধা
বেদনাসিক্ত মনে।

আত্মত্যাগের মহিমা হয় না কভু ম্লান
ওদের চরণ চুমি
পরাজিত কুচক্রীরা, দেশ স্বাধীন
মুক্ত মাতৃভূমি।

স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস

- তাহমিদ হাসান

উচ্ছ্বসিত হৃদয় আমার
স্বাধীনতা ওই সুখে,
উল্লাসে আজ মাতোয়ারা
স্বাধীন বাংলার বুকে।

উচ্ছ্বাসে আজ আত্মহারা
লাল সবুজের সাথেই,
স্বাধীনতার সুখে মোরা
আত্মহারা তাতেই।

মুক্ত পাখির মতো আমি
নীল আকাশে উড়ি,
মন চায় উচ্ছ্বাসে আজ
উড়ি গগন জুড়ি।

উচ্ছ্বাসে আজ মত্ত হৃদয়
স্বাধীনতার ওই জন্য,
স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে আজ
হয়েছি মোরা ধন্য।

নাম স্বাধীনতা

- স্বপন কুমার দাস

একটি কণ্ঠস্বর যার নাম স্বাধীনতা।
এক শিহরণ জাগানো আহ্বান নাম স্বাধীনতা।
এক ঝড়ের ধ্বনির প্রতিধ্বনি নাম স্বাধীনতা।
আমার ভায়ের মায়ের রক্ত নাম স্বাধীনতা।
আমার ধর্ষিতা বোনের অশ্রু নাম স্বাধীনতা।
একটি জাতির জন্মের প্রসব বেদনা নাম স্বাধীনতা।
লাল-সবুজে রাঙিয়ে দেবার স্বপ্ন নাম স্বাধীনতা।
আমার শব্দকোষে প্রিয় শব্দ নাম স্বাধীনতা।
আমার চিরকালের ভালোবাসার কবিতা নাম স্বাধীনতা।
ছাব্বিশে মার্চ এক অঙ্গীকার নাম স্বাধীনতা।
"আমার সোনার বাংলা"
এক অহংকার নাম স্বাধীনতা।

কথা দাও স্বাধীনতা

- হুমায়ূন কবির

স্বাধীনতা স্বাধীনতা বারেক ফিরে চাও!
বাংলা মায়ের ইজ্জত নিয়ে কোথায় চলে যাও?
তোমার জন্য বাংলার মানুষ করেছে কত কষ্ট,
প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে যাঁরা শহিদ-বীরশ্রেষ্ঠ।
ত্রিশ লক্ষ বাঙালি বীর যুদ্ধে হল খুন,
তোমায় আনতে ইজ্জত দিল, দুই লক্ষ মা-বোন।
ছাত্র-শিক্ষক ডাক্তার সহ প্রাণ দিয়েছে কত,
কৃষক-শ্রমিক জেলে-মজুর পঙ্গু শতশত।
অমানুষিক অত্যাচারে দৃঢ় ছিল, পাক সেনাদের হাত
বাংলা মায়ের সন্তানেরা করল প্রতিবাদ।
দামাল ছেলে গর্জে বলে- "বাংলা তুমি কার?"
অত্যাচারী পাক সেনারা সেদিন মেনে নিল হার।
একে একে নয়টি মাস যুদ্ধ হয়ে যায়,
বীর বাঙালির রঙিন স্বপ্ন "স্বাধীনতা" পায়।
বীর শহিদের কাছে মোরা সবাই হলাম ঋণী,
"কথা দাও স্বাধীনতা" থাকবে চিরদিনই।

বীরশ্রেষ্ঠদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

-- মোনায়েম সাহিত্য

১৬ কোটি মানুষের এ দেশটির জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ তরুণ। এই তরুণরাই আগামীর কর্ণধার, জাতির ভবিষ্যত্। এ মাসটি আমাদের স্বাধীনতার। একাত্তরের কথা মনে কি পড়ে—৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা, হাজারো মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা, দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা। মনে কি পড়ে জাতির জনকের কথা—যার জন্য আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশ। মনে কি পড়ে জাতির বীরশ্রেষ্ঠ সাত সন্তানের কথা? মনে কি পড়ে লাখো মুক্তিযোদ্ধার কথা?

নতুন প্রজন্ম কি জানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বীরত্বের কথা? মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৩৩টি বিমান উড়িয়ে নিয়ে আসা এক বীর সন্তানের কথা? মতিউর রহমানের বিমানকে ধাওয়া করেছিল চারটি জঙ্গিবিমান। এই বীর সন্তানের কবর দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের করাচির মাসরুর বেচের চতুর্থ শ্রেণির কবরস্থানে। কবরের পাশে লেখা ছিল 'ইধার সো রাহা হ্যায় এক গাদ্দার'।

নতুন প্রজন্ম কি জানে—আমাদের হাবিবুর রহমান, বীরবিক্রম নামে একজন মানুষ ছিলেন! যিনি কি না যুদ্ধের সময় 'এসএউ ইঞ্জিনিয়ারস এলসিও' এবং 'এসটি রজার' নামের দুটি জাহাজ চরে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রজন্ম কি জানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে? —যিনি তাঁর জীবনের পুরোটা সময় উৎসর্গ করেছিলেন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য। যিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করে গিয়েছিলেন। যিনি জাতিসংঘের সভায় বাংলাতে ভাষণ দিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁকে বিবিসি বাংলা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে জরিপে তুলে ধরেছিল। যিনি বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও বলব আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'

আমাদের দেশের এই প্রজন্মের কাছে বিদেশের ফিদেল কাস্ট্রো আইডল, চে গুয়েভেরা আইডল, নেলসন ম্যান্ডেলা আইডল, মার্টিন লুথার কিং আইডল, মাও সেতুং আইডল! তারা স্মার্ট হতে চায়। কিন্তু তারা ভুলে যায়, বিশ্বে শেখ মুজিব নামের একজন আইডল আছেন। যিনি আমাদের দেশের সর্বকালের সেরা আইডল।

এই প্রজন্মের একটি অংশ চীনের সমাজতন্ত্র মুখস্ত করে ফেলে, আমেরিকার ইতিহাস তাদের ঠোঁটের মুখে থাকে। তারা ভিন্ন দেশের ইতিহাস জানতে পেরে নিজেকে স্মার্ট মনে করে, কিন্তু তারা নিজের দেশের ইতিহাস ভালোভাবে জানে না।

তবে এই প্রজন্মের ভেতরেই আরো একটি অংশ আছে—যারা অনেক মহত্ কাজ করে দেশের দুর্যোগের সময়ে। এই তরুণ প্রজন্মকে দেখা যায় শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এক হতে। এই প্রজন্মকে দেখা যায় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ভ্যাট প্রত্যাহার এর দাবিতে এক হতে। এই প্রজন্মকেই দেখা যায় রানা প্লাজায় দুর্ঘটনার সময়ে অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে। এই প্রজন্মকে দেখা যায় বন্যার সময় আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি মিডিয়ার সামনে স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটির অনেক শিক্ষার্থী বলতে পারে না—একুশে ফেব্রুয়ারি কী দিবস? ২৬ মার্চ কী দিবস? ১৬ ডিসেম্বর কী দিবস?

যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্পর্কে জানেন না না জানলেও পূর্নরূপে জানেন না, তাদের জন্য এই লেখা। আশা করি, এই লেখাটি বাংলার সূর্য সন্তানদের সম্পর্কে সবাইকে একটি মোটামুটি পূর্ণ তথ্য দেবে।

১. বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (মার্চ ৭, ১৯৪৯- ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭১): বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন-

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ১৯৪৯ সালে বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার। তিনি ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং ১৯৬৬ তে আই.এস.সি পাশ করার পর বিমান বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু চোখের অসুবিধা থাকায় ব্যর্থ হন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৮-র ২ জুন তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা-

১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানে ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়ানে কর্তব্যরত ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি ছুটে এসেছিলেন পাকিস্তানের দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে। তবে ৩ জুলাই পাকিস্তানে আটকে পড়া আরও তিনজন অফিসারসহ তিনি পালিয়ে যান ও পরে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরে সাব সেক্টর কমান্ডার হিসাবে যোগ দেন। তিনি সেক্টর কমান্ডার মেজর নাজমুল হকের অধীনে যুদ্ধ করেন। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখানোর কারণে তাঁকে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বাধীনতার উষালগ্নে বিজয় সুনিশ্চিত করেই তিনি শহিদ হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ আঙিনায় সমাহিত করা হয়।

যেভাবে শহিদ হলেন-

১০ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর, লেফটেন্যান্ট কাইয়ুম, লেফটেন্যান্ট আউয়াল ও ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের পশ্চিমে বারঘরিয়া এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর ভোরে মাত্র ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে বারঘরিয়া এলাকা থেকে ৩/৪ টি দেশি নৌকায় করে রেহাইচর এলাকা থেকে মহানন্দা নদী অতিক্রম করেন। নদী অতিক্রম করার পর উত্তর দিক থেকে একটি একটি করে প্রত্যেকটি শত্রু অবস্থানের দখল নিয়ে দক্ষিণে এগোতে থাকেন। তিনি এমনভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা করেছিলেন যেন উত্তর দিক থেকে শত্রু নিপাত করার সময় দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু কোনকিছু আঁচ করতে না পারে। এভাবে এগুতে থাকার সময় জয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত তখন ঘটে বিপর্যয়। হঠাৎ বাঁধের উপর থেকে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সের ৮/১০ জন সৈনিক দৌড়ে চর এলাকায় এসে যোগ দেয়। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তান বাহিনীর অবিরাম ধারায় গুলিবর্ষন। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর জীবনের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যান। ঠিক সেই সময়ে শত্রুর একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয় জাহাঙ্গীরের কপালে। শহিদ হন তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননা-

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক বীরশ্রেষ্ঠ পদক দেওয়া হয় মহিউদ্দনী জাহাঙ্গীরকে। বরিশালের নিজ গ্রামের নাম তাঁর দাদার নামে হওয়ায় পরিবার ও গ্রামবাসীর ইচ্ছে অনুসারে তাঁর ইউনিয়নের নাম 'আগরপুর' পরিবর্তন করে 'মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর' ইউনিয়ন করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল জেলা পরিষদ ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বীরশ্রেষ্ঠর পরিবারের দান করা ৪০ শতাংশ জায়গার ওপর নির্মাণ করছে বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার।

২. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (২৯ অক্টোবর, ১৯৪১—২০ আগস্ট, ১৯৭১): একজন বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত হন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে চরম সাহসিকতা আর বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সাতজন বীরকে সর্বোচ্চ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান তাদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন-

মতিউর রহমান ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকার ১০৯ আগা সাদেক রোডের পৈত্রিক বাড়ি "মোবারক লজ"-এ জন্মগ্রহণ করেন। ৯ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে মতিউর ৬ষ্ঠ। তাঁর বাবা মৌলভী আবদুস সামাদ, মা সৈয়দা মোবারকুন্নেসা খাতুন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পাস করার পর সারগোদায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী পাবলিক স্কুলে ভরতি হন। ডিস্টিংকশনসহ মেট্রিক পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে রিসালপুর পি,এ,এফ কলেজ থেকে কমিশন লাভ করেন এবং জেনারেল ডিউটি পাইলট হিসাবে নিযুক্ত হন। এরপর করাচির মৌরীপুরে জেট কনভার্সন কোর্স সমাপ্ত করে পেশোয়ারে গিয়ে জেটপাইলট হন। ১৯৬৫ তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ফ্লাইং অফিসার অবস্থায় কর্মরত ছিলেন। এরপর মিগ কনভার্সন কোর্সের জন্য পুনরায় সারগোদায় যান। সেখানে ১৯৬৭ সালের ২১ জুলাই তারিখে একটি মিগ-১৯ বিমান চালানোর সময় আকাশে সেটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে দক্ষতার সাথে প্যারাসুট যোগে মাটিতে অবতরণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ইরানের রানী ফারাহ দিবার সম্মানে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত বিমান মহড়ায় তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালি পাইলট। রিসালপুরে দু'বছর ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হিসাবে কাজ করার পর ১৯৭০ এ বদলি হয়ে আসেন জেট ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় ছুটিতে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা-

১৯৭১ সালের শুরুতে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মতিউর সপরিবারে দুই মাসের ছুটিতে আসেন ঢাকা। ২৫ মার্চের কালরাতে মতিউর ছিলেন রায়পুরের রামনগর গ্রামে । পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হয়েও অসীম ঝুঁকি ও সাহসিকতার সাথে ভৈরবে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুললেন । যুদ্ধ করতে আসা বাঙালি যুবকদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকলেন । মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা অস্ত্র দিয়ে গড়ে তুললেন একটি প্রতিরোধ বাহিনী । ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি বিমান বাহিনী 'সেভর জেড' বিমান থেকে তাঁদের ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করে । মতিউর রহমান পূর্বেই এটি আশঙ্কা করেছিলেন । তাই ঘাঁটি পরিবর্তনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পান তিনি ও তাঁর বাহিনী । এরপর ১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল ঢাকা আসেন ও ৯ মে সপরিবারে করাচি ফিরে যান । ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট শুক্রবার ফ্লাইট শিডিউল অনুযায়ী মিনহাজের উড্ডয়নের দিন ছিল । মতিউর পূর্ব পরিকল্পনা মতো অফিসে এসে শিডিউল টাইমে গাড়ি নিয়ে চলে যান রানওয়ের পূর্ব পাশে । সামনে পিছনে দুই সিটের প্রশিক্ষণ বিমান টি-৩৩ । রশিদ মিনহাজ বিমানের সামনের সিটে বসে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসতেই তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলে বিমানের পেছনের সিটে লাফিয়ে উঠে বসলেন। কিন্তু জ্ঞান হারাবার আগে মিনহাজ বলে ফেললেন, তিনিসহ বিমানটি হাইজ্যাকড হয়েছে । ছোটো পাহাড়ের আড়ালে থাকায় কেউ দেখতে না পেলেও কন্ট্রোল টাওয়ার শুনতে পেল তা । বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মতিউর বিমান নিয়ে ছুটে চললেন। রাডারকে ফাঁকি দেবার জন্য নির্ধারিত উচ্চতার চেয়ে অনেক নিচ দিয়ে বিমান চালাচ্ছিলেন তিনি ।

যেভাবে শহিদ হলেন-

২৫ মার্চের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। পরে তিনি দৌলতকান্দিতে জনসভা করেন এবং বিরাট মিছিল নিয়ে ভৈরব বাজারে যান। পাক-সৈন্যরা ভৈরব আক্রমণ করলে বেঙ্গল রেজিমেন্টে ই,পি,আর-এর সঙ্গে থেকে প্রতিরোধ বুহ্য তৈরি করেন। এর পরই কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে জঙ্গি বিমান দখল এবং সেটা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২০ আগস্ট সকালে করাচির মৌরিপুর বিমান ঘাঁটিতে তারই এক ছাত্র রশীদ মিনহাজের কাছ থেকে একটি জঙ্গি বিমান ছিনতাই করেন। কিন্তু রশীদ এ ঘটনা কন্ট্রোল টাওয়ারে জানিয়ে দিলে, অপর চারটি জঙ্গি বিমান মতিউরের বিমানকে ধাওয়া করে। এ সময় রশীদের সাথে মতিউরের ধ্বস্তাধস্তি চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে রশীদ ইজেক্ট সুইচ চাপলে মতিউর বিমান থেকে ছিটকে পড়েন এবং বিমান উড্ডয়নের উচ্চতা কম থাকায় রশীদ সহ বিমানটি ভারতীয় সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে থাট্টা এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। মতিউরের সাথে প্যারাসুট না থাকাতে তিনি নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ ঘটনাস্থল হতে প্রায় আধ মাইল দূরে পাওয়া যায়। রশীদকে পাকিস্তান সরকার সম্মানসূচক খেতাব দান করে। প্রসঙ্গতঃ একই ঘটনায় দুই বিপরীত ভূমিকার জন্য দুইজনকে তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতাব প্রদানের এমন ঘটনা বিরল। মতিউরকে করাচির মাসরুর বেসের চতুর্থ শ্রেণির কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

২০০৬ সালের ২৩ জুন মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় ২৫ জুন শহিদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

৩. বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান (জন্ম:২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ - মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১): বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে। মাত্র ১৮ বছর বয়সে শহিদ হওয়া হামিদুর রহমান সাত জন বীর শ্রেষ্ঠ পদকপ্রাপ্ত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন-

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান জন্ম ১৯৫৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তদানিন্তন যশোর জেলার (বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা) মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে।তাঁর পিতার নাম আব্বাস আলি মন্ডল এবং মায়ের নাম মোসাম্মাৎ কায়সুন্নেসা। শৈশবে তিনি খালিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় নাইট স্কুলে সামান্য লেখাপড়া করেন।

কর্মজীবন

১৯৭০ সালে হামিদুর যোগ দেন সেনাবাহিনীতে সিপাহি পদে। তাঁর প্রথম ও শেষ ইউনিট ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সেনাবাহিনীতে ভরতির পরই প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে পাঠানো হলো চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে। ২৫ মার্চের রাতে চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ওখানকার আরও কয়েকটি ইউনিটের সমন্বয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা-

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে চাকরিস্থল থেকে নিজ গ্রামে চলে আসেন। বাড়িতে একদিন থেকে পরদিনই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চলে যান সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ধলই চা বাগানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ধলই বর্ডার আউটপোস্টে। তিনি ৪নং সেক্টরে

যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে হামিদুর রহমান ১ম ইস্টবেঙ্গলের সি কোম্পানির হয়ে ধলই সীমান্তের ফাঁড়ি দখল করার অভিযানে অংশ নেন। ভোর চারটায় মুক্তিবাহিনী লক্ষ্যস্থলের কাছে পৌঁছে অবস্থান নেয়। সামনে দু প্লাটুন ও পেছনে এক প্লাটুন সৈন্য অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে শত্রু অভিমুখে। শত্রু অবস্থানের কাছাকাছি এলে একটি মাইন বিস্ফোরিত হয়। মুক্তিবাহিনী সীমান্ত ফাঁড়ির খুব কাছে পৌঁছে গেলেও ফাঁড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত হতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মেশিনগানের গুলিবর্ষণের জন্য আর অগ্রসর হতে পারছিল না। অক্টোবরের ২৮ তারিখে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পাকিস্তান বাহিনীর ৩০এ ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্টের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড হামলার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেনেড ছোড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় হামিদুর রহমানকে। তিনি পাহাড়ি খালের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। দুটি গ্রেনেড সফলভাবে মেশিনগান পোস্টে আঘাত হানে, কিন্তু তার পরপরই হামিদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। সে অবস্থাতেই তিনি মেশিনগান পোস্টে গিয়ে সেখানকার দুই জন পাকিস্তানী সৈন্যের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু করেন। এভাবে আক্রণের মাধ্যমে হামিদুর রহমান এক সময় মেশিনগান পোস্টকে অকার্যকর করে দিতে সক্ষম হন। এই সুযোগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল উদ্যমে এগিয়ে যান, এবং শত্রু পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে সীমানা ফাঁড়িটি দখল করতে সমর্থ হন। কিন্তু হামিদুর রহমান বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেননি, ফাঁড়ি দখলের পরে মুক্তিযোদ্ধারা শহিদ হামিদুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে। হামিদুর রহমানের মৃতদেহ সীমান্তের অল্প দূরে ভারতীয় ভূখন্ডে ত্রিপুরা রাজ্যের হাতিমেরছড়া গ্রামের স্থানীয় এক পরিবারের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। নীচু স্থানে অবস্থিত কবরটি এক সময় পানির তলায় তলিয়ে যায়। ২০০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার হামিদুর রহমানের দেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ রাইফেলসের একটি দল ত্রিপুরা সীমান্তে হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ গ্রহণ করে, এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে কুমিল্লার বিবিরহাট সীমান্ত দিয়ে শহিদের দেহাবশেষ বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। ১১ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে ঢাকার বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

পুরস্কার ও সম্মাননা-

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক বীরশ্রেষ্ঠ পদক দেওয়া হয় সিপাহি হামিদুর রহমানকে। এছাড়া তাঁর নিজের গ্রাম 'খোর্দ খালিশপুর'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হামিদনগর। এই গ্রামে তাঁর নামে রয়েছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঝিনাইদহ সদরে রয়েছে একটি স্টেডিয়াম। ১৯৯৯ সালে খালিশপুর বাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি কলেজ । স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর এই শহিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর গ্রামে লাইব্রেরি ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১২ জুন ২০০৭ সালে এই কলেজ প্রাঙ্গণে ৬২ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে শুরু হয় এই নির্মাণ কাজ।

৪. বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (জন্ম: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭- এপ্রিল ৮, ১৯৭১) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন-

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাবিবুর রহমান সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার ছিলেন। শৈশব থেকেই দুঃসাহসী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পড়াশোনা বেশিদূর করতে পারেননি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর উচচ বিদ্যালয়ে দু-এক বছর অধ্যয়ন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা-

১৯৬৭-র ১৬ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক। ১৯৭১-এর প্রথম দিকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে ঘিরে তিনটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটি গড়ে তোলে এন্ডারসন খালের পাঁড়ে। আখাউড়ায় অবস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দক্ষিণ দিক থেকে নিরাপত্তার জন্য দরুইন গ্রামের দুই নম্বর প্লাটুনকে নির্দেশ দেয়। সিপাহি মোস্তফা কামাল ছিলেন দুই নম্বর প্লাটুনে। কর্মতৎপরতার জন্য যুদ্ধের সময় মৌখিকভাবে তাঁকে ল্যান্স নায়েকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

যেভাবে শহিদ হলেন-

১৬ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুমিল্লা-আখাউড়া রেললাইন ধরে উত্তর দিকে এগুতে থাকে। ১৭ই এপ্রিল পরদিন ভোরবেলা পাকিস্তান সেনাবাহিনী দরুইন গ্রামে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের উপর মর্টার ও আর্টিলারীর গোলাবর্ষণ শুরু করলে মেজর শাফায়াত জামিল ১১ নম্বর প্লাটুনকে দরুইন গ্রামে আগের প্লাটুনের সাথে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। ১১ নম্বর প্লাটুন নিয়ে হাবিলদার মুনির দরুইনে পৌছেন। সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তার নিকট থেকে গুলি নিয়ে নিজ পরিখায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বেলা ১১ টার দিকে শুরু হয় শত্রুর গোলাবর্ষণ। সেই সময়ে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সাড়ে ১১টার দিকে মোগরা বাজার ও গঙ্গা সাগরের শত্রু অবস্থান থেকে গুলি বর্ষিত হয়। ১২ টার দিকে আসে পশ্চিম দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ। প্রতিরক্ষার সৈন্যরা আক্রমণের তীব্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। কয়েক জন শহিদ হন। মোস্তফা কামাল মরিয়া হয়ে পাল্টা গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর পূর্ব দিকের সৈন্যরা পেছনে সরে নতুন অবস্থানে সরে যেতে থাকে এবং মোস্তফাকে যাবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তাদের সবাইকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগের জন্য মোস্তফা পূর্ণোদ্যমে এল.এম.জি থেকে গুলি চালাতে থাকেন। তাঁর ৭০ গজের মধ্যে শত্রুপক্ষ চলে এলেও তিনি থামেননি। এতে করে শত্রু রা তাঁর সঙ্গীদের পিছু ধাওয়া করতে সাহস পায়নি। এক সময় গুলি শেষ হয়ে গেলে, শত্রুর আঘাতে তিনিও লুটিয়ে পড়েন।

পুরস্কার ও সম্মাননা-

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক পদক বীরশ্রেষ্ঠ পদক দেওয়া হয় মোহাম্মদ মোস্তফা কামালকে। এছাড়া তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজ প্রাঙ্গণের একটি কোণে ভোলা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল লাইব্রেরি ও জাদুঘর নির্মাণ করা হয়। এছাড়া মোস্তফা কামালের নামানুসারে গ্রামের নাম মৌটুপীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে কামালনগর।

৫.বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ(১৯৪৩ - এপ্রিল ৮, ১৯৭১) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী-

মুন্সি আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের মে মাসে ফরিদপুর জেলার মধুখালি উপজেলার (পূর্বে বোয়ালমারি উপজেলার অন্তর্গত) সালামতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মেহেদি হোসেন এবং মাতার নাম মকিদুন্নেসা। কিশোর বয়সে রউফ-এর পিতা মারা যান। ফলে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৬৩-র ৮ মে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ ভরতি হন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৩১৮৭। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ কর্মরত ছিলেন। সে সময় তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন।

যেভাবে শহিদ হলেন-

৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির সাথে বুড়িঘাটে অবস্থান নেন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙামাটি-মহালছড়ি জলপথ প্রতিরোধ করার জন্য ৮ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের দুই কোম্পানি সৈন্য, সাতটি স্পিড বোট এবং দুটি লঞ্চে করে বুড়িঘাট দখলের জন্য অগ্রসর হয়। তারা প্রতিরক্ষা বূহ্যের সামনে এসে ৩" মর্টার এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ অবিরাম গোলা বর্ষন শুরু করে। গোলাবৃষ্টির তীব্রতায় প্রতিরক্ষার সৈন্যরা পেছনে সরে বাধ্য হয়। কিন্তু ল্যান্সনায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ পেছনে হটতে অস্বীকৃতি জানান। নিজ পরিখা থেকে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করেন। মেশিনগানের এই পাল্টা আক্রমণের ফলে শত্রুদের স্পিড বোট গুলো ডুবে যায়। হতাহত হয় এর আরোহীরা। পেছনের দুটো লঞ্চ দ্রুত পেছনে গিয়ে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শুরু করে দুরপাল্লার ভারী গোলাবর্ষণ। মর্টারের ভারী গোলা এসে পরে আব্দুর রউফের উপর। লুটিয়ে পড়েন তিনি, নীরব হয়ে যায় তাঁর মেশিনগান। ততক্ষণে নিরাপদ দূরুত্বে সরে যেতে সক্ষম হন তাঁর সহযোদ্ধারা।

শহিদ ল্যান্স নায়েক বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য জেলা রাঙামাটির নানিয়ার চরে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্ব্বোচ সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করে।

৬. বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৯৩৫ - ডিসেম্বর ১০, ১৯৭১) : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৯৩৫ সালে নোয়াখালি জেলার বাঘচাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আজহার পাটোয়ারী, মাতা জোলখা খাতুন। তিনি বাঘচাপড়া প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে আমিষাপাড়া হাই স্কুলে ভরতি হন। ১৯৫৩ সালে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগদান করেন।

কর্মজীবন-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন আরব সাগরে অবস্থিত মানোরা দ্বীপে পি.এন.এস বাহাদুর-এ প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর পি.এন.এস. কারসাজে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে পেশাগত প্রশিক্ষণ শেষ করেন। ১৯৬৫ -তে মেকানিসিয়ান কোর্সের জন্য নির্বাচিত হন। পি.এন.এস. কারসাজে কোর্স সমাপ্ত করার পর আর্টিফিসার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম পি.এন.এস. বখতিয়ার নৌ-ঘাটিতে বদলি হয়ে যান। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ঘাটি থেকে পালিয়ে

যান। ভারতের ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে ২ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে থেকে বিভিন্ন স্থলযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী গঠিত হলে কলকাতায় চলে আসেন। ভারত সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কে কলকাতার গার্ডেন রিজ ডক ইয়ার্ডে দুটি গানবোট উপহার দেয়। গানবোটের নামকরণ করা হয় 'পদ্মা' ও 'পলাশ'। রুহুল আমিন পলাশের প্রধান ইঞ্জিনরুমে আর্টিফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা-

১৯৭১ সালের মার্চে রুহুল আমিন চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। একদিন সবার অলক্ষ্যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে পড়েন নৌঘাঁটি থেকে। পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে তিনি চলে যান ত্রিপুরা। যোগ দেন ২ নং সেক্টরে। মেজর শফিউল্লাহ্ নেতৃত্বে ২ নং সেক্টরে তিনি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং স্থলযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীর সদস্যদের যাঁরা বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ করছিলেন তাঁদেরকে সেপ্টেম্বর মাসে একত্রিত করা হয় আগরতলায় এবং গঠন করা হয় ১০ নং সেক্টর। ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন নৌবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে আগরতলায় একত্রিত হয়ে কলকাতায় আসেন এবং যোগ দেন ১০ নং নৌ সেক্টরে।

যেভাবে শহিদ হলেন-

৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী যশোর সেনানিবাস দখলের পর 'পদ্মা', 'পলাশ' এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর একটি গানবোট 'পানভেল' খুলনার মংলা বন্দরে পাকিস্তানি নৌ-ঘাটি পি.এন.এস. তিতুমীর দখলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-এ প্রবেশ করে। ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২ টার দিকে গানবোটগুলো খুলনা শিপইয়ার্ডের কাছে এলে অনেক উচুঁতে তিনটি জঙ্গি বিমানকে উড়তে দেখা যায়। শত্রুর বিমান অনুধাবন করে পদ্মা ও পলাশ থেকে গুলি করার অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সর্বাধিনায়ক ক্যাপ্টেন মনেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিমান মনে করে গুলিবর্ষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এর কিছুক্ষণ পরে বিমানগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে নিচে নেমে আসে এবং আচমকা গুলিবর্ষণ শুরু করে। গোলা সরাসরি 'পদ্মা' এর ইঞ্জিন রুমে আঘাত করে ইঞ্জিন বিধ্বস্ত করে। হতাহত হয় অনেক নাবিক। 'পদ্মা'-র পরিণতিতে পলাশের অধিনায়ক লে. কমান্ডার রায় চৌধুরী নাবিকদের জাহাজ ত্যাগের নির্দেশ দেন। রুহুল আমিন এই আদেশে ক্ষিপ্ত হন। তিনি উপস্থিত সবাইকে যুদ্ধ বন্ধ না করার আহ্বান করেন। কামানের ক্রুদের বিমানের দিকে গুলি ছুড়ঁতে বলে ইঞ্জিন রুমে ফিরে আসেন। কিন্তু অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে বিমানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিমানগুলো উপূর্যপুরি বোমাবর্ষণ করে পলাশের ইঞ্জিনরুম ধ্বংস করে দেয়। আহত হন তিনি। কিন্তু অসীম সাহসী রুহুল আমিন তারপর-ও চেষ্টা চালিয়ে যান পলাশ কে বাঁচানোর। অবশেষে পলাশের ধ্বংশাবশেষ পিছে ফেলেই আহত রুহুল আমিন ঝাঁপিয়ে পড়েন রূপসা-এ। প্রাণশক্তি-তে ভরপুর এ যোদ্ধা একসময় পাড়ে-ও এসে পৌছান। কিন্তু ততক্ষণে সেখানে ঘৃণ্য রাজাকারের দল অপেক্ষা করছে তার জন্য। আহত এই বীর সন্তান কে তারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে রূপসা-র পাড়ে-ই। তাঁর বিকৃত মৃতদেহ বেশকিছুদিন সেখানে পড়ে ছিলো অযত্নে, অবহেলায়।

বীরশ্রেষ্ট সম্মান-

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাতজন বীর সন্তানকে মরণোত্তর বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সেই তালিকাতে নাম যুক্ত করা হয় মোহাম্মদ রুহুল আমিনের।

৭. বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৩৬ - সেপ্টেম্বর ৫, ১৯৭১): বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী-

১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে নূর মোহাম্মদ শেখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা জেন্নাতুন্নেসা। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারান ফলে শৈশবেই ডানপিটে হয়ে পড়েন। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভরতি হন। সপ্তম শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করেননি। নিজ গ্রামেরই সম্পন্ন কৃষক ঘরের মেয়ে তোতাল বিবিকে বিয়ে করেন। ১৯৫৯-এর ১৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বা ইপিআর-এ যোগদান করেন। দীর্ঘদিন দিনাজপুর সীমান্তে চাকরি করে ১৯৭০ সালের ১০ জুলাই নূর মোহাম্মদকে দিনাজপুর থেকে যশোর সেক্টরে বদলি করা হয়। এরপর তিনি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালে যশোর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ৮নং সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ চলাকালীন যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর সীমান্তের বয়রা অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদা'র নেতৃত্বে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

যেভাবে শহিদ হলেন-

১৯৭১- এর ৫ সেপ্টেম্বর সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষার সামনে যশোর জেলার গোয়ালহাটি গ্রামে নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে পাঁচ জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পাঠানো হয়। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পেট্রোলটি তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। পেছনে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এক সময়ে সিপাহি নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ নান্নু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এল.এম.জি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করলে শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হয়। হঠাৎ করেই শত্রুর মর্টারের একটি গোলা এসে লাগে তাঁর ডান কাঁধে। ধরাশায়ী হওয়া মাত্র আহত নান্নু মিয়াকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। হাতের এল.এম.জি সিপাহি মোস্তফাকে দিয়ে নান্নু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তফার রাইফেল চেয়ে নিলেন যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণে ঐ রাইফেল দিয়ে শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখবেন এবং শত্রুর মনোযোগ তাঁর দিকেই কেন্দ্রীভুত করে রাখবেন। অন্য সঙ্গীরা তাদের সাথে অনুরোধ করলেন যাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে গেলে সবাই মারা পড়বে এই আশঙ্কায় তিনি রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। বাকিদের অধিনায়োকোচিত আদেশ দিলেন তাঁকে রেখে চলে যেতে। তাঁকে রেখে সন্তর্পণে সরে যেতে পারলেন বাকিরা। এদিকে সমানে গুলি ছুড়তে লাগলেন রক্তাক্ত নূর মোহাম্মদ। একদিকে পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদিকে মাত্র অর্ধমৃত সৈনিক (ই.পি.আর.) সম্বল একটি রাইফেল ও সীমিত গুলি। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা এই মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধাকে বেয়নেট দিয়ে বিকৃত করে চোখ দুটো উপড়ে ফেলে। পরে প্রতিরক্ষার সৈনিকরা এসে পাশের একটি ঝাড় থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। এই বীরসেনানীকে পরবর্তীতে যশোরের কাশিপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়।

(লেখাটিতে বর্ণিত তথ্যসমূহ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহীত।)